রোমাঞ্চ একাদশ

অনুষ্টুপ শেঠ

অরণ্যমন প্রকাশনী

ভূ মি কা

এগারো— এই শব্দটা শোনামাত্র অনেকের অনেক কিছু মনে হয়। ফুটবল, ক্রিকেট বা তেমনই কোনো খেলায় একটি দলের খেলোয়াড়-সংখ্যা মনে পড়ে কারও। তারই সঙ্গে জেগে ওঠে প্রিয় দলের সাফল্য বা ব্যর্থতা নিয়ে কিছু ভাবনা। কারও বা মনে পড়ে মাধ্যমিক আর উচ্চ-মাধ্যমিকের মাঝের চিঁড়েচ্যাপটা বছরটা। কোচিং ক্লাসের বাইরে অপেক্ষা, প্রথম সিগারেট, প্রথম... মানে নস্ট্যালজিয়া জাগিয়ে তুলতে পারে সংখ্যাটা।

আমি এ-সব ব্যাপারে অত্যন্ত রসকষহীন ব্যক্তি। আমার বরং মনে পড়ে একাদশ রুদ্রের কথা।

রুদ্র কে? সেই উত্তর দিতে একটা থান ইট মাপের বইও যথেষ্ট নয়। আমার তেমন কিছু লেখার যোগ্যতা আছে বলেও মনে হয় না। নিতান্ত সহজ কথায় বললে, শিবের একটি বিশেষ রূপের এগারোটি প্রকাশ হলেন এঁরা। এঁরা সবাই যে ধ্বংসাত্মক, তা নন। কিন্তু এঁদের জানা মানে প্রতি মুহূর্তে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করা— কখন কালের করাল দংষ্ট্রা গ্রাস করবে আমাদের।

সেই কাজই করবে এই এগারোটি ক্ষুরধার গল্প।

কোনো এক গোত্রের বা বর্গের, এমনকি এক জঁর-এর গল্প পাবেন না এখানে। তার বদলে আপনার সামনে আসবে—

একেবারে ধ্রুপদী রহস্যভেদের আখ্যান।

ডার্ক ফ্যান্টাসি।

অলৌকিক কাহিনি।

কল্পবিজ্ঞান।

সমাজের গভীরতম কিছু অসুখের ক্রূর, তমসাচ্ছন্ন প্রকাশ।

তবে যে গল্পই পড়ুন না কেন, মনের ভেতরে ঘড়িটা টিক্-টক্ শব্দ তুলে বুঝিয়ে দেবে, বয়ে চলেছে কাল। তার হাতের স্টপওয়াচ বন্ধ হতে পারে যে-কোনো সময়! আপনি তৈরি তো?

ঋজু গাঙ্গুলী

সূ চি প ত্র

ওভার	১১
স্বপ্নদূত	৩৯
নিশাচর	৫৬
একদিন বৃষ্টিতে	৬৮
রাত্রিবাস	৭৬
সময়সম্ভব	৮৮
হনন	১০৯
পার	১২১
খোলস	১৩১
সেনগুপ্ত-ভিলার হত্যা রহস্য	১৬০
ছাতিম	১৮৬

ওভার

ঘাটের এদিকটায় বিশেষ লোকজন আসে না। জায়গাটা অত পরিপাটিও নয়, সিঁড়িগুলো ভাঙা, ঝোপঝাড় গজিয়েছে পাশে। বেলায় তবু কিছু উটকো লোক এই নিরিবিলিটায় সরে এসে চান করে, ধাপে বসে, পিছনের বস্তির ফুলমণি তার শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া হলে কাপড় ধোওয়ার অছিলায় ভাঙা সিঁড়িতে এসে বসে থাকে, এক এক দিন বিকেলের দিকে বস্তির দুরন্ত বাচ্চাগুলো হুটোপাটি করতে করতে চলে আসে। কিন্তু এই সাতসকালে, এখনও বাড়ি বাড়ি খবরের কাগজ দিয়ে যায়নি, চুনির চায়ের দোকানের নড়বড়ে বেঞ্চ ভরে ওঠেনি, এমনকি দুধের প্যাকেট রাখা গুমটির সুখিয়া রাস্তা ঝাঁট দিতেও শুরু করেনি দোকান খোলার আগে... এই অসময়ে একটা শার্ট-প্যান্ট পরা ভদ্দর বাবুগোছের লোকের এই ঘাটে আসার মতো

আশ্চর্য ঘটনা আগে কখনও দেখেনি পিন্টু।

নীল শার্ট, কালো প্যান্ট। লোকটা রেলিংটায় হেলান দিয়ে বামদিকে কেতরে বসে আছে, মুখ গঙ্গার দিকে ফেরানো। পিছন থেকে দেখে বয়স খুব বেশি মনে হচ্ছে না।

কী কেস? ওই সন্ধে হলে যেসব জোড়া এসে বসে ওদিকের ঘাটে, তাদেরই কেউ না কি? দুঃখের চোটে বিবাগী হয়ে... আরে দূর! নিজেই হেসে ফেলে পিন্টু। ওসব আবার আজকালকার দিনে কেউ করে নাকি! জুটি কেটে গেলে বয়েই যায়, বিন্দাস আর কাউকে জুটিয়ে ফেলে দু'জনেই। কত দেখল!

হয়তো ব্যাবসা ফেল করেছে। কি চাকরি গেছে। বা চুরি জোচ্চুরি করে ধরা পড়ে গেছে...

একটু চমকে দেখবে? পিন্টুর ক'দিন ধরে হাত একদম খালি, কিছু যদি বাগানো যায় এর থেকে...

এগিয়ে যায় পিন্টু।

"এই-য্-যে!"

সাড়া নেই।

"ও মশাই!"

এবারও সাড়া না পাওয়াতে মনটা কু-ডাক ডাকছিল, সামনে পৌঁছানো মাত্র পিন্টু বুঝে গেল সন্দেহটা সত্যি।

রেলিং-এ ঠেকানো থাকায় পিছন থেকে বোঝা যায়নি, কিন্তু ঝুলে পড়া মুখ, খোলা দৃষ্টিহীন চোখ, জামাভরতি শুকিয়ে কালো হয়ে যাওয়া দাগ এবং সর্বোপরি গলার কাছে উঁচু হয়ে থাকা ছুরির বাঁটটা বলে দিচ্ছে যে এ লোকটা আর কখনোই কাউকে কিছু দেবে-টেবে না।

চারদিকে চট করে চোখ চালাল সে। না, কেউ ওকে দেখেনি।

হাওয়া হয়ে যাবার আগে সন্তর্পণে লোকটার দু'পকেট হাতড়ে দেখে নিতে ভোলেনি অবশ্যই পিন্টু, কিন্তু সেখানে কিছুই ছিল না।

***

"ক'টা নিরুদ্দেশ কেস রে লাস্ট সাত-আটদিনে?"
থানায় ফিরে ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই বন্ধুর দিকে প্রশ্নটা ছুড়ে দিল ইনস্পেকটর অরুণ সোম। সুব্রত হাই তুলে বলল,

"তিনটে তো! তার মধ্যে বাচ্চা ছেলেটাকে তো সেদিনই পাওয়া গেল, বাকি একজন ডেমেনশিয়া হওয়া বৃদ্ধ আর কমবয়েসি মেয়ে একজন।"

মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে বাতিল করলেন অরুণ। এটা তাহলে আননোন বডি। মানে কাজ বাড়ল। বিজ্ঞাপন দিতে হবে, গেজেটে তোলাতে হবে, আশপাশের থানায় ইনফো পাঠাতে হবে...

খবরটা দিয়েছিল চায়ের দোকানের বয় মিঠুন। বেলা বাড়ার পর অনড় চেহারাটা ঘাটে আসা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। চা সাপ্লাই দেবার সুবাদে মিঠুনের থানায় যাতায়াত আছে, তাই সে-ই এসেছিল খবর নিয়ে। অরুণ সবে গুছিয়ে বসেছে তখন টেবিলে। সুব্রত আর নির্মাল্য অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল, তাই কনস্টেবল রঘুনাথকে নিয়েই সোজা চলে গেছিল অরুণ।

দেখেই বুঝেছিল, এপাড়ার চেনাশোনা বজ্জাত বা ফ্যালনা লোকেদের কেউ নয়। তাই এসে আগে নিরুদ্দেশের খোঁজ।

নাঃ, আর দাঁড়িয়ে লাভ নেই। বডি পিএম-এ পাঠানো, রিপোর্ট লেখা— হাজারটা কাজ এখন।

***

রাত্তির ঝিকমিক করছে। যদিও আজ অমাবস্যা, তবু আজকালকার দিনে শহরের বুকে একদম নিকষ অন্ধকারের আর দেখা মেলে কই!

এক যদি না ঘাট পেরিয়ে, তারপরের কাদামাখা আঘাটা জমিটাও পেরিয়ে নদীর বাঁক ধরে এই জায়গাটিতে সরে আসা হয়।

এখানে চুপ্পুড় ঘন হয়ে নেমে এসেছে অশ্বত্থ আর শ্যাওড়া আর আরও কত পাঁচমিশালি গাছের ডাল। পাতায় পাতায় হালকা কাঁপন আছে আজ, নইলে মনে হত জমাট বাঁধা কোনো অন্ধকারপিণ্ড দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে গঙ্গার হালকা ছলাৎ ছলাৎ জলের আওয়াজ ছাপিয়ে উঠছে ঝিঁঝিঁর ডাক। তার চেয়েও তীব্র উপস্থিতি একটা কটু বিশ্রী গন্ধের।

সে গন্ধ ভেসে আসছে ওই গাছের সারির পিছন থেকে। ওদিকটা জঞ্জাল ফেলার পগার।

ছায়ামূর্তি ছটফট করছিল, অন্ধকার ফুঁড়ে দেখতে চাইছিল কেউ এল কি না। হয়তো কিছুতে আটকা পড়ে দেরি হচ্ছে, বা রাস্তা ফাঁকা পাচ্ছে না ঠিক।

গরজ বড়ো বালাই!

দূর থেকে টিভির অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এল এবার। ন'টার সিরিয়াল শুরু হয়েছে।

চলে যাবার জন্য সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল লোকটা। এমন সময়ে মৃদু একটা খসখস শব্দ বেজে উঠল পাশে।

ওটুকুই, আর চকিতে সাপের মতো কিছু একটা গলায় স্পর্শ, আর ব্যথা, চরম ব্যথা, অন্ধকারের চেয়েও গাঢ় অন্ধকারের চাদরে সব চাপা পড়ে যাওয়া।

***

স্বপ্নদূত

যখন পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু করলাম, তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি কী হতে চলেছে। ভাবব কি, তখন তো আমি উল্লাসে মশগুল! এতদিনের একাগ্র সাধনার পর সাফল্য পেয়েছি। আনন্দ করব না!

এই অভিযানে যাওয়ার জন্য নির্বাচিত হওয়া যে কতখানি বড়ো ব্যাপার, সে নিশ্চয়ই আর বলে দিতে হবে না? মহাবিশ্ব-ফোর্সের সবচেয়ে কঠিন ইউনিট ধরা হয় টিম 'স্বপ্নদূত'-কে। আমার আজন্মের ইচ্ছা, সেই কবে স্কুল থাকাকালীনই ইন্টারস্পেস প্রিলিমস-এ জানিয়ে এসেছিলাম যে আমি বড়ো হয়ে 'স্বপ্নদূত' মিশনে যেতে চাই।

অমন অবাক হয়ে চেয়ে আছেন কেন? ও হো ! ভুলেই গেছিলাম, আপনার কাছে এগুলো গ্রিক! আচ্ছা, জানেন,

গ্রিকরা যার মানে বোঝা যাচ্ছে না তাকে কী বলত? তারা বলত, এগুলো চাইনিজ মনে হচ্ছে। এখন আর কেউ এসব লোকাল ভাষা ব্যবহার করে না, তাই এখনও বলে কিনা কে জানে! মজার না?

দূষণ আর কিছু বিচ্ছিরি ভাইরাস— এই দুইয়ের প্রকোপে পৃথিবী বহুকাল আগেই মানুষের বসবাসের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। ত্রিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে পর পর কিছু চমকপ্রদ আবিষ্কার হওয়ার ফলে মহাকাশে যাতায়াত সহজ আর সুলভ হয়ে যায়। পৃথিবীর বড়োকর্তারা সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেননি তারপর। এক এক করে ইভ্যাকুয়েশন স্পেসশিপগুলো ছাড়তে শুরু করে কাছের গ্রহ, উপগ্রহ এবং কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর দিকে— প্রথমে পাইলট টিম নিয়ে, তারপর তাদের থেকে সবুজ সংকেত এলে বাকি সবাইকে নিয়ে। মোটামুটি কাছাকাছি অঞ্চলের লোকজনই এক একটা নতুন কলোনিতে গেছিল, যাতে নিজেদের মধ্যে নতুন করে মিলমিশ করতে সময় নষ্ট না হয়। যেমন পৃথিবীর চাঁদে গেছিল কানাডা আর গ্রিনল্যান্ডের লোকেরা। এভাবে আস্তে আস্তে সমস্ত দেশের সাধারণ মানুষদের বেশিরভাগই এখন সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে পৃথিবী মোটেই পরিত্যক্ত নয়। জনঘনত্বের চাপ কমে যাওয়ার পর বিজ্ঞানীদের যত্নে পৃথিবী, যাকে এখন বলা হয় 'মাদার প্ল্যানেট', আবার সজল-সবুজ-সুন্দর হয়ে উঠেছে অনেকটাই। তবে তাতে আর সাধারণ মানুষকে ফিরিয়ে আনা হয়নি, বদলে গড়ে উঠেছে সমস্ত বিভাগের হেডকোয়ার্টার, হাই লেভেলের সমস্ত ট্রেনিং সেন্টার, মিলিটারি স্ট্র্যাটেজিক বিভিন্ন ইউনিট। আমাদের স্পেস জগতের সবচেয়ে সুরক্ষিত ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রহ এখন পৃথিবীই।

ফলতঃ পৃথিবীতে রয়েছে এই সব ইউনিটে কাজ করা মানুষেরা, তাদের ফ্যামিলি এবং সাপোর্টিং স্টাফ। সাপোর্টিং বলতে শুধু অফিসের স্টাফই নয়, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, লাইব্রেরি, শপিং ইউনিট, এন্টারটেনমেন্ট ইউনিট, ক্লিনিং ইউনিট আর সেসবে কাজ করার লোকজন ইত্যাদি।

পার্থিব হিসাবে আমার যখন তেইশ বছর বয়স তখন আমি পৃথিবীতে এসেছি। আমার স্বপ্ন-যাত্রার সহযাত্রী ডেরেক আরও আগে এসেছিল, খুব ব্রিলিয়ান্ট ছিল তো ডেরেক, পৃথিবীর ইদানিংকালের সবচেয়ে বিখ্যাত কলেজ, ভারত ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি-তে রোবোসায়েন্স নিয়ে পড়ার সুযোগ পেয়ে গেছিল একুশ বছর বয়সেই। সেটাও আমি আসার আগেই।

এখন আমি আঠাশ, ডেরেক চৌত্রিশ। তবেই বুঝে নিন, এই স্বপ্নদূত ট্রেনিং কতখানি কড়া আর লম্বা হয়! আমাদের সঙ্গে আছেন মিশন-লিডার ইউকি জাজাবেরা। তিনি আটান্ন, এর আগে আরও একটা মিশন সফলভাবে করে এসেছেন।

ওহ্! দেখেছেন? আমি কে সেটাই তো বলিনি!

আমার নাম ভেরোনিকা ইভানোভিচ কে ডাব্লু ৩৭৩০১। এখন নামের মধ্যে পদবিটা বাহুল্য, অনেকেই রাখে না। আমি রেখেছি শখ করে। ভেরোনিকা নামটাও আমারই রাখা। সুন্দর না? বারো বছর বয়সে যে যার নাম পছন্দ করে সিস্টেমে এন্ট্রি করে নেয়। তার আগে অবধি আমার পরিচয় ছিল কে ডাব্লু ৩৭৩০১— মানে, কে ডাব্লু কলোনির ৩৭৩০১ আইডি। স্কুলে আবার ওর বেশি কী লাগে!

বাবা-মা? আরে দূর! ওসব কবেই বাতিল হয়ে গেছে। সব ল্যাবে। বাচ্চারা সবাই একসঙ্গে স্কুলেই বড়ো হয়, ওই ষোলো বছর বয়স অবধি। তার মধ্যেই বোঝা হয়ে যায় কার কীসে প্রতিভা, কে কোন কাজে কতদূর যেতে পারবে।

নিশাচর

এত রাত করে দিল আজ বৈশালীটা! নিজের মনেই গজগজ করতে করতে ওভারব্রিজে উঠছিল স্বাতী। যদিও মুম্বইতে এগারোটা কোনো রাতই না, তবু রাত ন'টার মধ্যে তাদের হাওড়ার পুরোনো বাড়িতে না ঢুকলেই বাবা কিংবা দাদার পঞ্চাশবার ফোন আসা আর এগিয়ে এসে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকার অভ্যাসে বেড়ে ওঠা মেয়ের কাছে এটা, এখনও, এত বছর পরেও, বেজায় রাত।

অবশ্য এখন কে বলবে সেটা দেখে! লম্বা ওভারব্রিজটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিচে দেখতে পাচ্ছিল সে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খুব কম লোক নেই প্ল্যাটফর্মগুলোয়। বৈশালীরা ওকে স্টেশনে ছেড়ে দিয়ে গেছে, ঠিকঠাক ট্রেন পেলে বারোটার মধ্যে নিজের ঘরে ঢুকে যাবে ও। এই সময়ে একটা ডিসপ্লে বোর্ড চোখে পড়ল। ধ্যাৎ! স্লো লোকাল। চলো, তা'ই সই!

"কোথায় যাবেন, ম্যাডাম?"

খসখসে, পুরুষালি গলা। কথাটা একেবারে কানের কাছে বলেছে কেউ। তার নিশ্বাসের হালকা গরম হাওয়া ঘাড়ের কাছে চামড়ার ওপর টের পেয়েছে স্বাতী। আপনা থেকেই চলার গতি দ্রুত হয়ে গেল তার।

এ জিনিস মুম্বইতে হয় না। প্রায় সাত বছর হয়ে গেছে তার এই শহরে, খুব মন বসে গেছে। মাঝারি মাপের যে সফটওয়্যার কোম্পানিতে কাজ করে সেখানে কাজের চাপ একটু থাকলেও ঝুটঝামেলা একদম নেই। অফিসের কাছেই ঘাটকোপারে ছোট্ট ওয়ান রুম কিচেন অ্যাপার্টমেন্ট, অফিসের পর নিজের রান্নাবান্না আর ল্যাপটপে মুভি দেখা, উইকএন্ডে এই রকম বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি নেমন্তন্ন, কিংবা দল বেঁধে ঘুরতে যাওয়া। একা একা চলাফেরা কম করেনি স্বাতী এসে অবধি, রাত্রিও হয়েছে বেশ কয়েকবার। কিন্তু কখনও এখানে রাস্তায় মেয়েদের বিরক্ত করতে দেখেনি কাউকে।

কিছুটা হনহন করে এসে, কৌতূহলেই পিছন ফিরে তাকাল স্বাতী।

যাহ্ বাবা! কেউ নেই!

লুকিয়ে পড়েছে কোথাও? হতে পারে। এত পিলার, আড়ালে সরে গেছে হয়তো, বা সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে যেতেও পারে...

কিন্তু আশ্চর্য। এরকম করবেই বা কেন কেউ?

পাগল-ছাগল হবে, বা নির্ঘাৎ বাইরের কেউ। এই শহরে প্রতিদিন এত লোক আসে সারা ভারত থেকে...

এরপরের ডানদিকের সিঁড়িটা দিয়ে ওকে নামতে হবে।

পা বাড়াতেই কানের কাছে আবার সেই গলা।

"ওদিকে যাবেন না।"

এমন চমকেছে, আর একটু হলেই হোঁচট খেত। কোনোমতে টাল সামলাল।

"কে? কে তুমি? কী চাই?"

এবার চেহারাটা দেখা গেল। কমবয়সি, একহারা লম্বা চেহারা। চোয়াল উঁচু, চোখ কোটরে বসা, কিন্তু উজ্জ্বল। নীল জামা, এমনিই প্যান্টের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে পরা। পায়ে বর্ষাতি চপ্পল।

স্বাতীর গলায় বেজায় রাগ ফুটে উঠছিল। লোকটা হাসল।

"ও ট্রেন আজ আসবে না। অ্যানাউন্স হল তো একটু আগে। আপনি খেয়াল করেননি।"

সে কী! এবার ভালো করে চেয়ে দেখল, ট্রেনের নামের পাশে সময় দেওয়া নেই তো! দুটো দাগ খালি। ঝুঁকে দেখে, এই প্লাটফর্মটা একদম শুনসান।

সত্যিই খেয়াল করেনি স্বাতী। মুশকিল হয়ে গেল তো।

এবার? ফিরে যাবে বৈশালীর কাছে? ও না, তা'ও তো হবে না! ওকে এখানে ড্রপ করে বৈশালী আর সন্তোষ তো সোজা পুনে বেরিয়ে গেল ড্রাইভ করে! সোমবার সকালে ফিরবে আবার। কল করে জানালে অবশ্য ফিরে আসবে নিশ্চয়ই, কিন্তু ওদের সব প্ল্যান চৌপাট করে দিতে বেজায় খারাপ লাগছে স্বাতীর।

"এখানে থাকবেন না, ম্যাডাম। বেরিয়ে যান, ক্যাব ডেকে নিন কোনো। আমি যাচ্ছি সঙ্গে নাহয়..."

আচ্ছা ছিনে জোঁক তো! স্বাতী রীতিমতো এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল, সাহায্যের আশায়।

"কেয়া হুয়া ম্যাডাম? প্রবলেম?"

সামনের সিঁড়ি দিয়ে যে মাঝবয়সি লোকটা উঠে এসেছে, তার বেশ পেটানো ষন্ডা চেহারা, ঠোঁটগুলো কালো আর মোটা,